# মহাশূন্যে শিবলিংগ

## নৃপেন্দ্র নাথ সরকার

**১ক খুঁদে দেবতা**

আম গাছে মুকুল এলেই অপেক্ষার শেষ হত না। আম পাকবে, খাব। কিন্তু একটু সমস্যা ছিল। ঠাকুরমা গাছের প্রথম দুটো আম দেবতার ভোগের জন্য রেখে দিত। বলত, “যা, ঠাকুর বাড়ী যা। খোকা বা পরান ঠাকুর-রে ড্যাইক্যা নিয়া আয়।” ওরা তখন হয়তো রাস্তায় মার্বেলের গুটি দিয়ে খেলছে। খেলা বাদ দিয়ে সাথেসাথেই চলে আসত। এর মধ্যে একটা আকর্ষণ ছিল। ঠাকুরমা একটা বাটিতে দুধ-মুড়ি দিত আর আম দুটো সযত্নে চুকলা ছাড়িয়ে বাটিতে ছেড়ে দিত। দেবতা আম-গোলা-দুধ-মুড়ি তৃপ্তি নিয়ে খেত। আম-দুধের গন্ধে ঘর ভরে যেত। আমার জিভের জল চুইয়ে পড়ত। ঠাকুরমা মাটিতে পড়ে থাকা আমের চুকলা দুটো আমার হাতে ধরে দিত। তাই চেঁটেপুটে খেতাম। খাওয়া শেষে ঠাকুরমা একটি চকচকে আধ-আনি দক্ষিনা দিত খোকার হাতে। খোকা নাচতে নাচতে চলে যেত। ঠাকুরমা তখন আর একটি বাটিতে আম দুধের সাথে মুড়ি মেখে দিত। আমের চুকলা আর আঁটিতে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকত ঠাকুরমা তাই খেত আর আমার আম খাওয়ার দৃশ্য দেখে পরম তৃপ্তিলাভ করত।

**১খ নিয়ম মেনে চলতে হয়**

আমার আমের জন্য অপেক্ষা করা নিশ্চয় ঠাকুরমাকে পীড়া দিত। কিন্তু তাতে কি? ঠাকুরমার তো কিছু করার ছিল না। গাছের প্রথম ফলটার ভাগীদার একজন দেবতা। সেই দেবতা ফলটি ভক্ষন করবেন, আম খাওয়া উদ্বোধন হবে, তারপর গাছের মালিকের অনুমতি হবে। এটাই নিয়ম। ঠাকুরমা তো নিয়ম বহির্ভূত কাজ করতে পারেনা। আমিও জেনে গেছি নিয়ম নিয়মই। নিয়ম নিয়মিত চলতে থাকে। ধর্ম থেকে সৃষ্ট এই সব নিয়ম মগজে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। আমার আমের জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষা ঠাকুরমার হয়তো তেমন কষ্ট হতনা।

**১গ ঠাকুরমার ভূতে বিশ্বাস**

ভূত আছে কি নেই, তার ঠিক নেই, কিন্তু ভয় আছে তা সত্য। ধর্মের সাথে ভুতের মিল আছে। ধর্মের নিয়ন্তা ঈশ্বর (ঈশ্বর শব্দটি ব্যবহারই নিরাপদ।)

ঈশ্বর আছে কি নেই
তার নেই কোন ঠিক
তার সবই বেঠিক
তাকে শুধুই ভয়, এটাই ঠিক।

ধর্ম বড়ই শক্তিশালী। এদের অবস্থান মগজে। জন্মের পর থেকেই এরা মগজটাকে ধোলাই করে শক্ত ঘাটি বানিয়ে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। মানুষের নিজস্ব চেতনাবোধে ক্ষত সৃস্টি করে। এই ভুতের বদৌলতে আমার ঠাকুরমা তার নিজের নাতিকে বঞ্চিত করতে পেরেছেন। ঠাকুরমা তাঁর নিজের নাতি বাদ দিয়ে অন্যের নাতিকে আগে যত্ন-আত্তি করে কোন কষ্ট পাননি, বরং পরম শান্তিই পেতেন।

**১ঘ চলছে-চলুক**

খোকা আমার সমবয়সী। এক সাথে খেলতাম, ঝগড়া-ফগড়াও করতাম। সে তো যখন খেলি তখন। ধর্মের প্রসংগ এলে একই খোকাকে দেবতা বানানো হয়। খোকার কোন দোষ নেই। আমরাই বানাই। আমার ঠাকুরমা বানায়, আমি বানাই। নেপালে সব মেয়েই মেয়ে। আবার কোন এক বিশেষ মেয়ে দেবী, কুমারী। কোন প্রশ্ন করার প্রশ্নই হয় না। সংস্কার, নিয়ম। নিয়ম নিয়মের মত চলে। খোকার মধ্যে কোন দেবত্ব আছে কি নেই, এ নিয়ে সংশয়ের কোন স্থান নেই। কারন, এটিই নিয়ম। নিয়মের বাইরে গেলেই অনিয়ম। অনিয়ম থেকে বিশৃংখলা, মারমারি, হানাহানি। তসলিমা নারী নির্যাতনের কথা বলেছে বলেই যত বিপত্তি। নির্যাতিতা নারীও তসলিমার বিপক্ষে সাফাই দিচ্ছে। বোরখার ভেতরে আবদ্ধা রমনীর বিশ্বাস ওই বোরখার ভিতরেই স্বাধীনতার স্বর্গসুখ। নিবিড় বিশ্বাসের মোহে, নির্যাতন নির্যাতনই মনে হয়না; বরং ওর মধ্যেই আছে মাদকতা, তৃপ্তি, আনন্দ, নারীর সমান অধিকার আর গগনচুম্বী সন্মানবোধ।

বনের পাখীরে ডাকি বলিছে খাঁচার পাখী
আমি থাকি মহাসুখে ঝড়ঝঞ্জার নেই ঝুকি
তোমার চোখে ঘুম নাই, খাবার মিলবে কোথা
খাটে বসে খাই আর ছড়াই হেথা আর হোথা
নিজের মনে গাও তুমি কিচির মিচির গান
বুম্বাই ট্রেনিং দিছে মোরে জানের জান।

দুই নারী সমান এক নর,
ইহাই জানিবে নারীর সম-অধিকার!

**২ মহাশূন্যে শিবলিংগ**

পৃথিবীর উচ্চতম ডিগ্রীধারী একজন শিক্ষিত ব্যক্তি, বিবর্তনবাদ, পদার্থবিদ্যা বা মহাশূন্য গবেষনায় নোবেল পুরস্কার পেয়ে যাবেন হয়তো। মগজ ভর্তি পদার্থ বিদ্যা বা মহাশূন্যের নতুন নতুন তত্ত্ব, পাঁচ-দশখানা আইনস্টাইন-ডারউইন ঢুকে আছে মগজে। কিন্তু ধর্মের প্রসংগে এই জগত বিখ্যাত লোকটিও হয়তো যবুথবু হরিদাস পাল, একজন পূণ্যার্থী। দেখা যাবে কোন এক মন্দিরে মহাশূন্য গবেষক হরিদাস পাল বৌয়ের হাত ধরে শিবলিংগে দুধ ঢেলে পূণ্য সঞ্চয়

করছেন। মহাবিশ্বের সৃষ্টিরহস্য নিরুপণে মগ্ন মহাশূন্য বিজ্ঞানী শিবলিংগে বুঝিবা নতুন তথ্য খোঁজে পান। দুধ ঢালতে ঢালতে একসময় স্ত্রীর কথা ভূলে শিবলিংগ নিয়ে মহাশূন্যে পাড়ি জমান।

পৃথিবী বিখ্যাত পদার্থবিদটি যদি একজন মুসলমান হন, ধর্মের কথা হলেই 'তুমি আর... নও সে তুমি। তুমি এখন আয়েত আলী মিয়া। যুক্তিবাদী আরজ আলী মাতুব্বরের নখের যুগ্যিও না।' পদার্থবিদ আয়েত আলী বা মহাশূন্য গবেষক হোসেন মিয়াকে হয়তো দেখা যাবে মক্কার বাতাসে শয়তান আছে ভেবে পাথর ছুড়তে। এদের মনে সামান্য প্রশ্নও জাগবে না, বাতসে কোথায় শয়তান?

### ৩ নব নব দেবতার আবির্ভাব

১১ই মার্চ ২০০৮ তারিখে ভারতে দিল্লীর ৩১ মাইল পুবে দুই মুখ নিয়ে জন্মগ্রহন করল লালি। এটি একটি অস্বাভাবিক জন্ম। হাজারো বিড়ম্বনা আছে ভবিষ্যতে। কিন্তু হিন্দু পূণ্যার্থীরা বুঝে ফেলেছে, লালি আর কেউ নয়, স্বয়ং কোন দেবী। কোন দেবী? তেত্রিশ কোটির মধ্যে হবে একজন! শুরু হয়ে গেল পূজো-অর্চনা। হায়রে লালি! তুই বুঝলি না তুই কি জিনিষ! অস্ত্র-প্রচারে আলাদা করা? স্বয়ং দেবীর গায়ে আঘাত। অসম্ভব। ধর্মে সইবে না। যত বেশী অদ্ভুত ঘটনা ঘটবে, হিন্দু ভাববে তত বড় দেবতা।

বাংলাদেশে নতুন আরও একখানা দেবতার সংযোগ ঘটেছে। নাম বাবা লোকনাথ। ছোটবেলায় লোকনাথের পঞ্জিকা দেখেছি। হয়তো সেই লোকনাথই এখন নতুন দেবতা। মুহাম্মদ একটা ভাল কাজ করে গেছেন। একটা শক্ত দাঁড়ি টেনে দিয়ে গেছেন। আমার পরে আর কোন পয়গম্বের আগমন হবে না। বাস্! নতুন পয়গম্বরে্র আর কোন উৎপাত নেই। কিন্তু ভারত একটি উন্মুক্ত এবং উর্বর দেশ। যখন তখন দেবতাদের আবির্ভাব হয়। সারা হিন্দুস্থানে যে সময় তিন লাখ লোকও ছিলনা, তখনই দেব-দেবীর সংখ্যা ছিল তেত্রিশ কোটি। তারপর একে একে নতুন আরও কত দেব-দেবী যোগ হয়েছে কে তার হিসেব রাখে?

### ৪ক পেশা ছেড়ে অপেশা

তসলিমা নাসরিন নিজেই নির্যাতিতা। ছয়-সাত বছর বয়সে আপনজন দ্বারা লাঞ্ছিতা হয়েছেন। দেখেছেন নিজের পরিবারে ব্যভিচার, পীর এবং ধর্মীয় মৌলবাদের প্রভাব। মা পীরের বাড়িতে জিকির করতেন। মায়ের সাথে পীরের কথা, কোরানের বাণী শুনতেন। জীবনের শুরুতে এত কিছু দেখে শুনে যুক্তি দিয়ে বুঝার চেষ্টা করতেন। পীরের যুক্তি বুঝার জন্য কোরান ভালভাবে পড়লেন। আবার পড়লেন। কোরান পড়ে তাঁর মনের যন্ত্রনা উপশম হলনা। বরং আবিষ্কার করলেন নারী নির্যাতনের প্রচুর মশলা আছে ওতে। পুরুষ সবসময়ই নারীর এক ডিগ্রী উপরে (২:২২৮), দুই নারী এক পুরুষের সমান (২:২৮২), মনে করলে পুরুষ মহিলাকে পিটাবে (৪:৩৪), ইত্যাদি।

মানুষের রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত করার মহান ব্রত নিয়ে চিকিৎসা পেশাকে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি দেখলেন, সারা দুনিয়ার অর্দ্ধেক মানুষ ভয়ানক এক কোষ্ঠ রোগে আক্রান্ত! সাধারন চিকিৎসার জন্য ভূড়ি ভূড়ি ডাক্তার তৈরী হচ্ছে ফি-বছর। কিন্তু সামাজিক কোষ্ঠ রোগটি দেখার কেউ নেই। ভাবেও না কেউ। ঘোরের মধ্যে বাস করে রোগী নিজেই জানেনা সে কতবড় অসুখ নিয়ে খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলছে।

ব্যামো সারাতে গেলে প্রথমে রোগ নির্নয় করতে হয়। রোগ নির্নয় করতে রোগের গভীরে প্রবেশ করতে হয়। সমাজে নারী রাতে ভোগের সামগ্রী আর দিনে তার সঞ্চালন মাত্রা রান্না ঘর থেকে খাবার টেবিল। মানুষের মৌলিক অধিকার একজন নারীর নেই। ধর্মগ্রন্থ কোরানেও নারীর অধিকার সীমিত, নির্যাতন সহায়ক। মানুষকে রোগমুক্ত করে জনসেবার চেয়ে নারীর মুক্তিই তাঁর কাছে জরুরী হয়ে দাঁড়াল। মালেকা বেগমদের মত পায়ের উপর পা তুলে জীবনটাকে উপভোগ করতে পারতেন। কখনো সখ হলে নারী নেতা সেজে সভা-সমিতিতে বাণী প্রচার করতে পারতেন। তিনি তা করতে পারলেন না। স্টেথোস্কোপ ছেড়ে ধরলেন কলম।

### ৫ক জ্ঞানতীর্থ, জ্ঞানচূড়ামনিদের বেহাল অবস্থা

মানুষের মগজ ধর্মের দেহ, আর বিশ্বাসবোধই তার আত্মা। ধর্মের প্রথম ও প্রধান শর্ত বিশ্বাস স্থাপন। এই বিশ্বাসের মৃত্যু হলেই ধর্ম থেকে মানুষের নির্বান লাভ। আর মানুষে মানুষে ধর্মভিত্তিক ভেদাভেদের অবসান ঘটে। অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এর জন্য দরকার নতুন মতবাদ দ্বারা নিজেকে মহাপুরুষে উন্নীত করে বাকী সবাইকে মোহাবিস্ট করে রাখা। নতুন মতবাদকে শক্তিশালী করতে মাত্র একটি মিথ্যা দরকার। বলতে হবে, আমি কেউ নই, আমি ঈশ্বরের প্রতিনিধি মাত্র। আমি যা বলি এগুলো সবই তাঁর কথা। মহাপুরুষটি একদিন মারা যাবেন কিন্তু তাঁর বানী-চিরন্তনী ধর্ম নামে সময়ের সাথে অনড় হয়ে বসে থাকবে। অতীতে তাই ঘটেছে। মোহাবিস্ট অনুগামীরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধর্মকে মগজে ধারন করে কৃতার্থ হচ্ছে। মহাপুরুষের ধজ্জ্বাধারীরা প্রতিষ্ঠিত বানীকে অক্ষত রাখার দৃঢ় প্রত্যয়ে যুগে যুগে পাতি মহাপুরুষের সৃস্টি হচ্ছে। ধর্মের ধারা অব্যাহত রাখার অপচেষ্টা চলেছে। সময় এগিয়ে চলেছে। বিজ্ঞানীরা সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে গবেষনা করে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীদের নব নব আবিষ্কার ও প্রযুক্তির কল্যানে প্রতি নিয়তই শতাব্দীর পুরনো অনড় ধর্মীয় বাণীগুলো অসারে পর্যবসিত হচ্ছে, ন্যুব্জ হচ্ছে। তখন জ্ঞানতীর্থ, জ্ঞানচূড়ামনিদের নীচ থেকে চিমটি কাটা ছাড়া আর কোন উপায় থাকছে না।

### ৫খ তালগাছ একপায়ে দাঁড়িয়ে

হাজার, দেড়-হাজার, দু-হাজার বছর আগে, বিজ্ঞান চর্চা তেমন ছিলনা। পৃথিবী ছিল আধ্যাতিকতার চারণক্ষেত্র। বড় বড় বুলি আর প্যাচালের যুগ। ফলে প্রতিটি ধর্মের নেতা ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের অপ্রতিরুদ্ধ অগ্রগতির ধারা অনুধাবন করতে পারেননি। তাঁরা নিজেদেরকে গগনচূম্বী তাল গাছ আর ধর্মকে প্রকান্ড তাল ভেবেছিলেন। ভাবতে পারেননি তাল একদিন মাটিতে থুবড়ে পড়বেই।

তালগাছ একঠাঁয়ে দাঁড়িয়ে
আশ-পাশ ছাড়িয়ে
উকি মারে আকাশে-দুরে
মনে ভাবে
আমি কি হনুরে ...

ঘুড়ি ভাবে,
তালগাছ তুই তালগাছ
মাটির সাথে তোর সহবাস
দেখ, মেঘের কাছে আমি
ভাসি শূন্যে, আমি অন্তর্যামী।

তালগাছ জানেনা মৃত্যু তার শিরোধার্য। পাতা বিবর্ণ হবে। গাছ শুকিয়ে মারা যাবে। উনুনে চাপিয়ে গৃহবধূ একদিন পিঁয়াজো ভাজবে। ঘুড়ি আকাশে মাথা আর লেজ নেড়ে তুবড়ি বাজায়। জানেওনা ঝাপ্টা বাতাসে কখন সুতো ছিড়ে মাটিতে হূমড়ি খেয়ে পড়বে অথবা গাছের ডালে ঝুলতে থাকবে, কখন বাশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠবে, আর তার কাজলা দিদি শোলক শোনাবে।

তালগাছেরা ভেবেছিলেন এই পৃথিবী তখন যেমন ছিল, হাজার বছর পরেও তেমনি থাকবে। তাঁদের বক্তব্য কোনদিন ভূল প্রমানিত হবে এমনটি ঘুনাক্ষরেও ভাবেননি। হাজার বছর আগের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে নিজের চৌকষ বুদ্ধিতে মাথায় যা এসেছে তাঁরা তাই বলেছেন। ফলে বাণী তাল গাছের মত ইতিহাসের পাতায় একপায়ে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে।

বিজ্ঞানের অপ্রতিরোদ্ধ অগ্রগতিতে অনেক বাণীই ভূল প্রমানিত হচ্ছে। নেতা চলে গেছেন। কিন্তু ধজ্বাধারীরা বিপাকে পড়ে গেছে। পথ একটাই বিজ্ঞানীর মুখ বন্ধ কর নতুবা জেলে ঢুকিয়ে রাখো। ধর্ম নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও আর ব্রুনোর মত বিজ্ঞানীদের মাথায় খড়্গ ধরেছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে সাময়িক ভাবে শ্লথ করেছে। থামাতে পারেনি। হিংস্রতা এখনও বন্ধ হয়নি। সময়ে সময়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

**৬ জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কেবা কবে**

নেতার মুখ থেকে ধর্মের জন্ম হয়েছে। কাজেই একদিন মৃত্যু হবে। প্রাচীন অনেক ধর্মেরই মৃত্যু ঘটেছে। যেগুলো এখনও দাপাদাপি করছে, এদেরও নিশ্চিত মৃত্যু হবে।

আম-জনতার মাথায় হাত বুলায়ে রাজা সেজে মগজ ধোলাই করা বিজ্ঞানী বা ইঞ্জিনীয়ারের কাজ নয়। এটি ধর্মনেতার কাজ। ধর্মনেতা যা বুঝেন এবং বলেন তার নাম বাণী। সব্বাইকে তা মেনে চলতে হবে। এর নাম শান্তি। না মানলে অশান্তি, বিবাদ। আর বিবাদ মানেই গর্দান। ধর্ম নিজে প্রানহীন। কিন্তু ধর্মধারীরা প্রানহীন নয়। এরা আপোষহীন। মারমুখী। ধর্মের কাছ থেকে বিজ্ঞানের নেওয়ার কিছু নেই। বরং, ধর্ম বিজ্ঞানী এবং ইঞ্জিনীয়ারের সৃষ্ট কৌশল অপব্যাবহার করে মানব সভ্যতার বিনাশের অপকৌশলে নিয়োজিত। বাঘ বা সিংহ একটি প্রাণী হত্যা করে। কিন্তু ধর্ম নাখোঁস হলে প্রাণ যায় লক্ষ লক্ষ মানুষের।

বিজ্ঞান কারও ধার ধারে না। বস্তু ও প্রকৃতির রস ও তথ্য অনুসন্ধানই বিজ্ঞানীর কাজ। ইঞ্জিনীয়ার বিজ্ঞানীর একীভূত জ্ঞান সমন্বয়ে নতুন যন্ত্র ও কৌশল তৈরী করে মানুষের জীবন ধারন সুন্দর ও আরামদায়ক করে। বিজ্ঞানের জন্ম নেই, কাজেই এর মৃত্যু নেই। নিউটন মহাকর্ষ বলের জন্ম দেননি। উনি শুধু তথ্যটি গুছিয়ে সবাইকে বলেছেন। কোন নেতা হননি। মাটির নীচে খনিজ পদার্থ যীশু খ্রীষ্টের জন্মের আগেও ছিল। বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন মাত্র। মেঘে মেঘে ঘর্ষনের ফলে বিদ্যুত তৈরী হয়। আগেও হত, এখনও হয়। আগে জ্ঞানের অভাব ছিল। সুযোগ বুঝে কোন ধূর্ত ব্যক্তি পন্ডিত হয়েছেন, "আরে, তোমরা কিছুই জান না। ঈশ্বর শুধু আমাকে বলেছেন। তোমরা তাঁকে ভয় কর না, তাই দন্ত-কপাটি দেখিয়ে ভয় দেখাচ্ছেন।" বিজ্ঞানের বিশেষ জ্ঞান না থাকা পর্যন্ত মানুষ বিশ্বাস করে এসেছে বিদ্যুত চমকানো সৃষ্টিকর্তারই কাজ। মানুষ কিছুই পারেনা। তিনি সবই পারেন। এটিও তাঁরই কাজ। মানুষ যখনই এর আসল তত্ত্বটি বুঝতে পেরেছে তখনই ধর্ম বিজ্ঞানকে শত্রু রুপে চিহ্নিত করেছে। সংঘাত হয়েছে। ধর্ম পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছে। ইদানীং সুর পাল্টাচ্ছে। সুর পাল্টাচ্ছে ব্যাখ্যায়, অনুবাদে।

### ৭ বিজ্ঞান ও ধর্মে সংঘাত নাকি সমন্বয়?

এ দুটোতে সংঘাত বা সমন্বয়ের কোন কারন নেই। দুটোর পথ ও উদ্দেশ্য ভিন্ন। ধর্মের উদ্দেশ্য হল অন্যের উপর প্রভাব ও প্রাধান্য বিস্তার করা। তাই রাজনীতিকে ধর্মের মাসতুত ভাই বলা চলে। অপর পক্ষে মানুষের উপর প্রাধান্য বিস্তার বা রাজনীতিবিদ হওয়ার খায়েস একজন বিজ্ঞানীর থাকে না। প্রাকৃতিক নিয়ম এবং বস্তু বা পদার্থের গুনাবলী নির্নয়কল্পে একজন বিজ্ঞানী আবিষ্ট মনে নিরলস কাজ করে চলে। বিজ্ঞানীদের নব নব আবিষ্কার হাজার বছরের পুরনো ধর্ম-ভিত্তিক ধারনা ভুলে পর্যবসিত হয়। ধর্ম তখন আঘাত প্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিষয়। একে ধরা যায় না। ধার্মিকটি প্রাকৃতিক নিয়মকে না ধরতে পেরে হাতের কাছের বিজ্ঞানীর গালে চড় মারে। বিজ্ঞানী একা। তাই তাকে আর একটা গাল বাড়িয়ে দিতে হয়।

তসলিমা জড় পদার্থ কিম্বা জীব বিজ্ঞানী নন। তিনি আদতে ছিলেন চিকিৎসক; কিন্ত সমাজকে তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণ করতে করতে পরিণত হন সমাজবিজ্ঞানীতে। ধর্ম নারী নির্যাতন সমস্যাটিকে জটিল ও স্পর্শকাতর করেছে।

তিনি সমস্যাটির কেন্দ্রে প্রবেশ করে এর বিশ্লেষণ করেছেন, সেখানে তিনি সম্পূর্ন একা। যা ঘটেছিল গ্যালিলিও, কোপার্নোকাস, ব্রুনোর ক্ষেত্রে, সেই একই ব্যভিচার চলছে এখন তাঁর ক্ষেত্রে। তিনিও একা মার খেয়ে যাচ্ছেন। একবিংশ শতকে ধর্মের প্রদীপ শিখা নিভু নিভু জ্বলছে। এযুগে গ্যালিলিও, কোপার্নোকাস, আর ব্রুনোরা নির্বিঘ্নে তাঁদের গবেষনা করতে পারছে। ধর্মের প্রদীপ সর্বত্রই নিভে আসবে। তসলিমাদের জন্য পৃথিবী হবে উন্মুক্ত। এখন যার জীবন কাটছে অন্তরীনে, সেই তসলিমা নাসরিনের সন্মানে বাংলার মানুষই একদিন গড়ে তুলবে আর এক স্ট্যাচু অব লিবার্টি।

---

ড. নৃপেন্দ্র নাথ সরকার পেশায় শিক্ষক ও গবেষক। বাংলাদেশ কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫ বছরের চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে ১৯৮৯ সালের জানুয়ারীতে আমেরিকা চলে আসেন। বর্তমানে তিনি টেক্সাসের প্রেইরী ভিউ এএন্ডএম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, গবেষক এবং প্রোগ্রাম উন্নয়ন নিরীক্ষা সমন্বয়ক। কৃষি যন্ত্রপাতি বাদ দিয়ে কম্পিউটার প্রকৌশলে অধ্যাপনা ও গবেষনায় নিয়োজিত। ইমেইল - nsarker@hotmail.com